বরাক উপত্যকার বাঙালি ঃ অস্তিত্ব ও অবয়বের সঙ্কট

সুজিৎ চৌধুরী

প্রাক্ কথন

'বরাক উপত্যকা' অভিধাটি একান্তই আধুনিক। বস্তুত এই শতকের শেষ পর্বেই আমাদের এই ভূখণ্ড অভিধাটি অর্জন করেছে। প্রাচীন ইতিহাসের বৃহৎ একটা পর্যায় জুড়েই এই অঞ্চল ছিল বঙ্গ সমতটের অংশ তারপর কিছু অংশ চলে গেছে বাংলার সুলতান আর মুঘলদের হাতে; কিছু অংশ হাতফেরতা হয়েছে ত্রিপুরা, কোচ এবং ডিমাছা রাজশক্তির মধ্যে। সর্বশেষ পর্যায়ে ডিমাছা রাজাদের হাতে যে অংশটা ছিল, তার অংশ বিশেষের নাম দেওয়া হয়েছিল কাছাড় জেলা, সেই কাছাড় জেলার পার্বত্য অংশ আজ চলে গেছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায়। সমতল অংশও দ্বিধাবিভক্ত, একটার নাম কাছাড় জেলা, একটা হাইলাকান্দি। এই দুটোর সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলাকে জুড়লে যে মানচিত্রটি তৈরি হয়, তারই আজকের নাম বরাক উপত্যকা। এই করিমগঞ্জ জেলা আবার বিভাগপূর্ব শ্রীহট্ট জেলারই একটা অংশমাত্র। নিকট অতীতের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় ১৭৬৫ সালে শ্রীহট্ট জেলা যায় ব্রিটিশের দখলে, আর ডিমাছা কাছাড়ীদের রাজ্য যায় ১৮৩২ সালে। কাছাড়ী রাজাদের রাজ্য ছিল বলে তার নাম দেওয়া হয় কাছাড় জেলা। শ্রীহট্ট জেলা তো বরাবরই ছিল মোগলদের সুবে বাংলার অংশ, আর ব্রিটিশ অধিকারে যাওয়ার পর কাছাড় জেলাও হয়ে পড়ল ব্রিটিশদের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ। ১৮৭৪ সালে যখন স্বতন্ত্র আসাম প্রদেশ গঠিত হল, তখন নতুন ওই প্রদেশর রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর জন্য শ্রীহট্ট ও কাছাড় দুটো জেলাকেই জুড়ে দেওয়া হল আসামের সঙ্গে। দুটো মিলে তৈরি হল একটা প্রশাসনিক ইউনিট, তার নাম দেওয়া হল সুরমা ভ্যালি ডিভিশন। কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এই তিনটি জেলা নিয়ে আজকের যে বরাক উপত্যকা, তা মূলতঃ ব্রিটিশ আমলের ওই সুরমা ভ্যালি ডিভিসনেরই একটা কর্তিত অংশমাত্র

নাম পরিবর্তনের এই ব্যাপারটা এমনিতে হয়তো আলোচনাযোগ্য বিষয় হত না, কিন্তু ইতিহাস ভুগোলের সকরুণ খেলার একটা বার্তা এর মধ্যে অন্তর্লীন রয়েছে। সাধারণভাবে ইতিহাস ও ভুগোল দুই-ই নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রে। শতাধিক বৎসর ধরে এই ভূখণ্ডের ইতিহাসকে নিরূপণ করেছে উপত্যকাবর্হিভূত রাজনীতির টানাপোড়েন, আর সেই আরোপিত ইতিহাসই নিয়ন্ত্রণ করেছে তার রাজনৈতিক মানচিত্রকে। প্রাকৃতিক ভূগোলের স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার তাতে কোনও ভূমিকা নেই। সমাজবিজ্ঞানের বিচারে বরাক উপত্যকা তাই নিপাতনে সিদ্ধ-তার রাজনৈতিক পরিচিতির সঙ্গে তা অভ্যন্তরীণ আশাআকাঙক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই।

বরাক উপত্যকার রাজনৈতিক ইতিহাস তার ধারাবাহিকতাকে বারবারই ক্ষুণ্ণ করেছে, কিন্তু সেটা কোনও বড় ক্ষতির কারণ নয়। একটি অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সেই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। সে বিষয়ে ধরাক উপত্যকার তেমন কোনও সঙ্কট থাকার কারণ নেই, এই উপত্যকার শতকরা আশি শতাংশ মানুষ বাঙালি, এবং তাদের বাঙালি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিরবচ্ছিন্ন। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে বঙ্গজ রাষ্ট্রসীমার জাটিঙ্গা উপত্যকা পর্যন্ত সম্প্রসারণের যে প্রমাণ আমরা সমতটের সামন্ত লোকনাথের তাম্রলিপিতে পাই তা সুলতানী আমল পর্যন্ত যে অব্যাহত ছিল, সে সম্পর্কে সংশয় নেই। পরবর্তী লিপিপ্রমাণে তার সাক্ষ্য রয়েছে। খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতক থেকে বরাক উপত্যকার বাঙালি অভিবাসন যে ধারাবাহিক ভাবেই চলে আসছে ঐতিহাসিক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর Cachar under the British Rule in North Eastern India গ্রন্থে তা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। বাঙালি ছাড়া অন্য যে সমস্ত জনগোষ্ঠী এই উপত্যকায় বসবাস করছেন তাঁরা সবাই এসেছেন এর পরবর্তীকালে—ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে, এবং সেই পর্যায়গুলি মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করা যায়। যাই হোক সাদা চোখে দেখলে বরাক উপত্যকার বাঙালিদের নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তার কারণ ধরা পড়ে না। অথচ দুশ্চিন্তার বাস্তব ভিত্তি যে রয়েছে, ১৯৬১, ১৯৭২ এবং ১৯৮৬ সালের ভাষা আন্দোলন আর শহিদের রক্তদানের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণই বর্তমান।

এর মূলে রয়েছে রাজনৈতিক মানচিত্রে বরাক উপত্যকার সংস্থান নিয়ে শতবর্ষব্যপী যে সমস্ত খেলা চলেছে, তারই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। আগেই বলা হয়েছে যে ১৮৭৪ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে কেটে নিয়ে তৎকালীন কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলাকে জুড়ে দেওয়া হল আসামের সঙ্গে - তার প্রশাসনিক নামকরণ হল সুরমা ভ্যালি ডিভিশন। বকচ্ছপ আসাম প্রদেশের মধ্যে বরাক উপত্যকার (বা সুরমা উপত্যকার) যথার্থ পরিস্থিতিটা কী তা নিয়ে জটিলতার সেই হল সূত্রপাত। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সুরমা উপত্যকাকে আবার ঢুকিয়ে দেওয়া হল নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হল, কিন্তু সুরমা উপত্যকাকে রেখে দেওয়া হল আবার আসামেরই সঙ্গে। এরপর এলো স্বাধীনতা এবং দেশভাগ এবং আসল ও মোক্ষম আঘাতটা দেওয়া হল তখন। সুরমা উপত্যকাই দ্বিধাভিক্ত হল আর বৃহত্তর অংশকে ঠেলে দেওয়া হল পাকিস্তানে। ক্ষুদ্রতর অংশটিকেই আমরা বরাক উপত্যকা বলি এবং 'বরাক উপত্যকা' এই অভিধাটি সর্বভারতীয় ক্ষত্রে যেটুকু জনপ্রিয়তা ও বৈধতা পেয়েছে, তাতে বোঝা যায় ক্ষতবিক্ষত এই ভূখণ্ড এতদিনে অন্তত যথাযথ একটি নামের আশ্রয় পেয়েছে।

এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক পরিচিতি এবং মানচিত্রের মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন, বিভাজন, পরিবর্জন, পরিবর্তন ইত্যাদি যা কিছু ঘটেছে, একমাত্র করিমগঞ্জে ও হাইলাকান্দির জেলা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া অন্য কোনওটার সঙ্গে বরাক উপত্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত বা ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও সংশ্রব ছিল না। প্রথমে বিদেশি এবং পরে দেশি ভারতভাগ্য বিধাতারা যথেচ্ছভাবে এই অঞ্চলের প্রশাসনিক ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং সেই অনুসারে এর মানচিত্রের উপর দাগ টেনেছেন আর রং বুলিয়েছেন। প্রাকৃতিক ভূগোল আর ভাষিক সামাজিক ঐতিহ্যের কোনওরূপ মূল্য দেওয়ার ইচ্ছা বা প্রবণতা তাঁদের ক্ষমতা বিলাসের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

বিদেশি প্রভুরা শোষণের জন্য মানচিত্র রচনা করত, তাই তারা সাংস্কৃতিক পরিচিতিটাকেই অস্বীকার করেছিল। দেশি প্রভুরা আরেক কাঠি সরেস। শাসনভার নেওয়ার জন্য তারার দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল-তারা প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক কোনও দিকেই আর দৃকপাত করেনি-গণভোটের প্রহসন করে শ্রীহট্টকে তুলে দিল পাকিস্তানের হাতে। ফলে বরাক উপত্যকা আজ বন্দী এক কৃত্রিম মানচিত্রের বেড়াজালে। আজ তিনদিকে পর্বতমালাদ্বারা (মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম) বেষ্টিত বরাক উপত্যকার প্রকৃতি-নির্দিষ্ট শুধুমাত্র পশ্চিমদিকেই উন্মোচিত। কিন্তু সেদিকে আমাদের হাঁটতে মানা, চলতে মানা — সেটাকে বিদেশ করে দেওয়া হয়েছে, যদিও তার নাম বাংলাদেশ। অর্থাৎ প্রকৃতি যেপথ সুগম করেছিল, সে পথ নিষিদ্ধ, আর সরকারিভাবে যে পথে হাঁটতে বলা হয়, দুর্গম পার্বত্য সে পথে পদচারণা দুঃসাধ্য-অন্ততঃ সমতলীয় বাঙালির বিচরণভূমি তা নয়। অতএব স্বাধীনতার

জন্মলগ্নেই বরাক উপত্যকা রাষ্ট্রীয় নীতির যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত। বিগত পাঁচদশক ধরে এই উপত্যকা যে দুর্দৈবের কবলে নিক্ষিপ্ত, তার একটা বড় কারণ রাজনৈতিক ভূগোলের এই সীমাবদ্ধতা।

অবশ্য কার্যকরণ সম্পর্ক নিরূপণও আপেক্ষিক—কেউ যদি বলেন যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাঙালি তার অভ্যন্তরীণ সংকটের নিরসন করতে পারেনি বলেই উপত্যকার রাজনৈতিক ভূগোল এমন দাঁড়িয়েছে, তবে সে যুক্তির জোরও সরাসরি নাকচ করা যায় না। সে সমস্ত জটিল বিতর্কে প্রবেশ করার প্রয়োজন আপাতত আমাদের নেই—ইতিহাস-ভূগোলের দ্বন্দ্বের ফলে বরাক উপত্যকাকে মূল্য দিতে হচ্ছে—একথাটা মনে রাখা দরকার বলেই এই সমস্ত কথা আলোচনার প্রাকপর্বেই সেরে নেওয়া গেল পরে কথাগুলো বলার সুযোগ পাওয়া যাবে না বলে।

এক

বাঙালি জাতিসত্তার মুখ্য পরিচয় ভাষা নির্ভর, ভাষা যেখানে বিপন্ন, অস্তিত্বও সেখানে বিপন্ন। সমাজতত্ত্বের পুঁথিগত আলোচনার দ্বারা অস্তিত্বের এই সঙ্কটের বিস্তার এবং গভীরতার উপলব্ধি সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক দায় হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অঞ্চলের বাঙালির বিপন্নতার প্রকৃতি নির্ণয়। বহিরঙ্গ দিয়ে বিচার করলে সে নিরূপণের কাজটা তেমন জটিলতায় আবৃত নয়। মোদ্দা কথাটা এভাবে বলা যায় যে বরাক উপত্যকার মানুষ নিত্যদিন যে বিপদ সম্ভাবনায় আতঙ্কিত, মূলত পরিচয়ে তা ভাষিক এবং সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিপীড়নগুলো সেই মৌলিক উৎস থেকেই উৎসারিত। আমাদের দেশের বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোতে এমনতরো সঙ্কট থেকে যদি উত্তীর্ণ হতে হয়, তবে সে প্রয়াসও একটা স্তরে রাজনৈতিক। হাতের কাছে খুব সহজ দৃষ্টান্ত ধরা যাক - বরাক উপত্যকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি - শিক্ষাগত এই দাবির বিচার কিন্তু শিক্ষাগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে আদৌ হয় নি - ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া যাচাই করেই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজনীতির অর্ন্তকাঠামোতে রয়েছে সমাজ - সমাজ দেহের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনই ফলিত রাজনীতির প্রাথমিক উপাদানগুলি যোগায় - অতএব প্রতিনিয়ত এই উপত্যকার বাঙালির উপর যে আঘাতগুলি এসে পড়ছে, তার রাজনৈতিক চেহারাটিকে ধরতে হলেও দরকার আমাদের সমাজদেহের অভ্যন্তরে কায়েমি হয়ে বসে থাকা কোন সমস্ত জটিলতাগুলো তার উপযোগী আবহকে গড়ে তুলেছে তা নিরূপণ করা।

বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্কট যদি এ উপত্যকায় ঘটে তাকে, এবং ঘটেছে যে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম - তাহলে ধরে নেওয়া যায় এখানে বাঙালিদের একটি সংহত সামাজিক অস্তিত্ব রয়েছে এবং আক্রমণের আঘাত তার উপর পড়ছে। জটিলতা কিন্তু একেবার এই প্রারম্ভিক প্রতিপাদ্যেই শুরু হয়ে যায়। প্রশ্ন তোলা যায় বরাক উপত্যকার বাঙালি কি সত্যিই কোনও সংহত সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ? আরও সোজা ভাষায় বলা যায় এখানে কি সে অর্থে বাঙালি সমাজ বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে? বলা প্রয়োজন যে বঙ্গভাষা যদিও বাঙালিত্বের একটা মৌল উপাদান, তবুও 'বাঙালি' পরিচিতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক আনুগত্যের একটা ব্যাপার অন্তর্লীন রয়েছে। সাধারণ অর্থে হয়তো বঙ্গভাষী মাত্রেই বাঙালি, কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের বিশেষ প্রেক্ষিতে বঙ্গভাষী মাত্রেই বাঙালি নন, তিনিই বাঙালি, যিনি বাঙালি জাতিসত্তার অংশ হিসেবে নিজের পরিচিতি সম্পর্কে সচেতন এবং বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান প্রবাহের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তাকে তার অস্তিত্বের অঙ্গ বলে মনে করেন। এ পার্থক্যের ধারণা যে একান্ত স্বকপোলকল্পিত নয়, তারা অকৃত্রিম প্রমাণ রয়েছে বাংলাদেশে। সেখানে এরশাদ ও বেগম জিয়া 'বাংলাদেশি' জাতিসত্তার তত্ত্বটিকে খাড়া করেছেন। প্রকারান্তরে তাঁরা বলতে চাইছেন বাংলাদেশিরা বঙ্গভাষী বটে, তবে 'বাঙালি' নন। সেখানে বাঙালি বনাম 'বাংলাদেশী' তত্ত্বের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই এখনও চলছে এবং সেই লড়াই এর ফয়সালা হলেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। আরেকটু ঢিলেঢালা প্রমাণ পাওয়া যাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। ১৯৫১ সালের লোকগণনার সময় থেকে সেখানকার পূর্ববঙ্গাগত অভিবাসীরা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন 'অসমিয়া' বলে। বাড়িতে, হাটে, বাজারে তাঁরা পূর্ববঙ্গীয় বাংলাতেই কথা বলেন, অর্থাৎ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁরা বঙ্গভাষী কিন্তু সরকারিভাবে তারা বাঙালিত্বকে পরিহারযোগ্য বিবেচনা করেছেন।

বরাক উপত্যকায় এ জাতীয় ব্যাপার তত্ত্ব হিসাবে আসে নি, তবে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় যথাযথ সময়ে নিজ সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করার প্রবণতা এখানেও বর্তমান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁদের অবস্থান একেবারে নিম্নতম বর্গে - যাঁরা অধিকাংশই হয়তো নিরক্ষর - তাঁদের কথা আমি বলছি না। কারণ প্রথমত ঃ সচেতন সাংস্কৃতিক আনুগত্য তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত নয়; দ্বিতীয়ত ঃ সারি - জারি - ভাটিয়ালি বাউল গানে বাঙালি সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানগুলিকে তাঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায়। আমি বলছি তাঁদের কথা যাঁরা শিক্ষাদীক্ষা বা চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রসর এবং সেই সঙ্গে জন্মসূত্রে বঙ্গভাষীও বটে। বরাক উপত্যকার দুর্ভাগ্য যে এঁদেরই একাংশ সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় নিজের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে শুধুমাত্র কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে বা প্রত্যাশায় বিক্রয়যোগ্য বিষয় হিসাবে তুলে ধরতে দ্বিধা করেন না। ফলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে বরাক উপত্যকায় বাঙালীত্ব এখনও সহজাত উপার্জনের পর্যায়ে পৌঁছয় নি — অর্থাৎ 'বরাক উপত্যকার বাঙালি সমাজ' এই কথাটা এখানে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায় না। একটা সমাজ তখনই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে যখন সভ্যের মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা কাজ করে। এমন নয় যে সমাজ সকল দিক দিয়েই সংহত একটা গোষ্ঠী, তার মধ্যে শ্রেণীগত বর্ণগত, পেশাগত বা অন্যধরনের বিভাজনের ব্যাপার থাকে, কিন্তু সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক লক্ষ্য সম্পর্কে যেকোনও সংগঠিত সমাজই সহমত পোষণ করে। বরাক উপত্যকার বঙ্গভাষী জনগোষ্ঠীর সেই ধরণের কোনও সাধারণ লক্ষ্য নেই - এমন কী নিজের মাতৃভাষাকে মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা ও সংশয় প্রকাশ করার মানুষ পর্যন্ত এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য পেছনে কাঞ্চনমূল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেই এই সমস্ত মাতৃঘাতীরা মাঠে নামেন। তাতেও ক্ষতি ছিল না - কিন্তু দেখা যায় যারা বাঙালিত্বের মৌলিক পরিচিতিকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে চায়, সাধারণ মানুষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য এই সমর্থনের পেছনেও কাজ করে নগদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা — কিন্তু একটা জাতিসত্তাকে আমরা সুসংগঠিত হিসাবে ধরে নেব, যখন সেই সত্তার যে বা যারা বেইমানি করে, তারা তীব্র জনরোষের শিকার হয়। বরাক উপত্যকায় তেমনটি ঘটে না, অতএব বলা যায় বরাক উপত্যকায় বাঙালি সমাজ বা জাতিসত্তা কোনওটাই ঠিকভাবে গড়ে ওঠে নি। সেই অসমাপ্ত প্রক্রিয়াকে সমাপ্ত করাটাই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব।

দুই

কোনও একভাষিক গোষ্ঠী যদি একটা সংহত জাতি সত্তা গঠনে ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে সেই গোষ্ঠীর মধ্যে নানা ধরণের বিভাজন রয়েছে। সাধারণভাবে এই ধরণের বিভাজন বস্তুগত ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে, কালক্রমে তা মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা অর্জন করে এক ধরণের স্থায়িত্ব অর্জন করে। উল্টোটাও

সীমিতক্ষেত্রে ঘটে থাকে, অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে যা মনস্তাত্ত্বিক বিভাজক কালক্রমে তাও বস্তুগত বিভাজনে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে বরাক উপত্যকায় দুটি প্রক্রিয়াই কাজ করছে। এখানে কী সমস্ত বিভাজনপ্রক্রিয়া কাজ করেছে, তা চিহ্নিত করাটাই প্রথমে প্রয়োজন - সমস্যার স্বরূপ বুঝলে তবেই সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা সম্ভব। বিভাগপূর্ব কাছাড় জেলার সমতল অংশ, যা আজকে কাছাড় ও হাইলাকান্দি, এই দুটো জেলায় বিভক্ত, তার কথাই আগে বলছি - কারণ বিভাজনটা ওখানেই বহুরূপে তার নানাবিধ বৈচিত্র নিয়ে অধিষ্ঠিত।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল তারিখে কাছাড় শিলচর শহরকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিটির মর্যাদা দেওয়া হয়। বঙ্গাব্দের হিসাবে তারিখটা হলো ১২৯৯ সালের ১৫ চৈত্র, অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দ শুরু হওয়ার আর মাত্র পনেরো দিন। বঙ্গীয় চর্তুদশ শতকের ঠিক জন্ম লগ্নেই তৎকালীন কাছাড় জেলা তার প্রথম শহরটিকে অর্জন করেছিল। কিন্তু সে - প্রাপ্তিটা যে খুব শুভ লগ্নে হয়েছিল, এমন কথা বলা যাবে না। শহর কথাটি কাছাড় জেলায় আধুনিক মুক্ত উদার নাগরিক মননের প্রতীক হিসাবে যতখানি কাজ করছে, তার চাইতে অনেক বেশি তাকে কাজে লাগানো হয়েছে বিভাজন ও বিভেদের হাতিয়ার হিসাবে। আজকের বৃহত্তর বরাক উপত্যকায়ও সেই হাতিয়ারের শাণিত ব্যবহার অবারিত। দেখা যাবে বরাক উপত্যকায় যখনই কোনও গণদাবি জোরের সঙ্গে উত্থাপিত হয়, তখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে এই উপত্যকাকে যারা শোষণ করছে, তারা এই উপত্যকায় তাদের প্রসাদভোজী যে সমস্ত স্থানীয় দালাল রয়েছে তারা তখন কতকগুলি বাঁধা বুলি কপচায়, তাদের মুখে যে বুলিটি ধরিয়ে দেওয়া হয়, তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে বরাক উপত্যকার গ্রাম ও শহরের মানুষের মতামতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। অর্থাৎ সরব আন্দোলনের দায়টা বর্তায় শহরের উপর, আর সেই সঙ্গে বলা হয় যে গ্রামের মানুষের নীরব অসম্মতি রয়েছে ওই ধরনের আন্দোলনে উত্থাপিত দাবিদাওয়া সম্পর্কে। কিছু কিছু ভুঁইফোঁড় সংগঠন ও ব্যক্তিকে দিয়ে ওই ধরনের বিবৃতি দেওয়ানো হয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সংবাদপত্র ও উগ্রজাতীয়বাদী সংগঠনগুলি এমন ঢক্কানিনাদে তার প্রচার করে যে তা এক ধরণের বৈধতা পেয়ে যায়। বরাক উপত্যকার অঞ্চল ভিত্তিক দাবিদাওয়া নিয়ে যখনই যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তা ভাষিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত বা অর্থনৈতিক যা নিয়েই হোক না কেন এই গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটাকে তখনই ব্যবহার করার চেষ্টা চলতে থাকে।

গ্রাম বনাম শহরের একটা বাস্তবদ্বন্দ্ব সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বর্তমান, বরাক উপত্যকায় তার কোনও ব্যতিক্রমে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বরাক উপত্যকায় কোনও স্বীকৃত গণদাবি প্রসঙ্গে যখন এই দ্বন্দ্বের কথাটা তোলা হয়, তখন গ্রাম বলতে আসলে গ্রাম বোঝায় না, শহর বলতেও শিলচর-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি জাতীয় শহরকে বোঝানো হয় না। এই দুই অভিধার অন্তরালে আসলে অন্য কোনও বিভাজনের কথা বলা হয়, যার সঙ্গে গ্রাম বা শহরের অভিধানগত অর্থের কোনও সম্পর্ক নেই। বরাক উপত্যকার সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যে বিভাজনগুলি বর্তমান, 'গ্রাম ও শহর-এর' পার্থক্যের কথা বলে সেগুলোকেই একটা শোভন আবরণে আবৃত করা হয় মাত্র। ফলে এ ধরনের বিতর্কে 'গ্রাম ও শহরে'র সংজ্ঞা নিত্য প্রয়োজনীয় থাকে এবং এক বা একাধিক বর্গ বা Category-কে এক একক বা যৌথ ভাবে ওই দুইটি সংজ্ঞার যেকোনও একটির শরিক বলে ধরে নেওয়া হয়। বর্গ বিভাজনের এই প্রক্রিয়ায় কারা কোনও ধরনের শরিক, তা মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট করা যায় ঃ

১) সর্বপ্রাচীন ও সবচাইতে অধিক ব্যবহৃত বিভাজনটা করা হয় স্থানীয় ও অস্থানীয়কে ভিত্তি করে। এই কৌশলটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমিয়া সম্প্রসারণবাদীদের স্থায়ী প্রকল্পের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে ওখানকার পত্র-পত্রিকায় এই বিভাজনের কথাটা খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়। অসমিয়া অনুবাদে 'অ-স্থানীয়' অর্থে 'ভগনীয়া' এবং আরও সাম্প্রতিককালে 'অনুপ্রবেশকারী' কথাগুলি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ওই শব্দগুলির অভিধানগত অর্থের সঙ্গে তার ব্যবহারিক ও ব্যঞ্জনাগত অর্থের মিল কোনও সময়ই থাকে না। আমরা বরাক উপত্যকার কথাটাই বলি।

এখানে স্থানীয় বলতে মূলত বোঝানো হত ডিমাসা রাজাজের আমল থেকে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদের। অর্থাৎ কাছাড়ীরাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে যাওয়ার আগেকার যারা বাসিন্দা; অস্থানীয় বলতে বোঝানো হতো ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যাঁরা এসেছেন, তাঁদের। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবশ্য এই সংজ্ঞা মানা হয় না। অবাঙালি মুসলমানদের প্রায় সকলকেই 'স্থানীয়' সংজ্ঞায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যেমন মণিপুরিরা প্রথমে আসেন উনিশ শতকের প্রথমদিকে বার্মিজ আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায়, তারপর সেই সূত্র ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে - শেষের দুটো পর্যায় হচ্ছে দেশভাগ ও বাংলাদেশ যুদ্ধ। শ্রীহট্ট জেলার মণিপুরিদের (মেইতেই ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুই গোষ্ঠীরই) বেশ বড় উপনিবেশ ছিল - দেশ ভাগের পর তাঁদের বড় অংশটাই উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসেন, আরও কিছুটা বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়েও। তারপর ধরা যাক চা-শ্রমিকরা-তাঁরা এসেছেন ব্রিটিশ আমলে চা-বাগান প্রতিষ্ঠান সময়ে এবং কিছু এসেছেন দেশভাগের পর শ্রীহট্টের চা-বাগান থেকে। কী আশ্চর্য ব্যাপার যে স্থানীয় বলে যাঁরা জিগির তোলেন, তাদের মধ্যে এঁদের অবলীলায় ধরা হয়, এরা যে সময়ে যেভাবেই এসে বসতি স্থাপন করেন না কেন। তার কারণটা খুব স্পষ্ট। বরাক উপত্যকার বুকে যাঁরা এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেন, তাঁরা তো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভাষা সম্প্রসারবাদীদের এজেন্ট মাত্র, তাই বাংলাভাষা সংস্কৃতির দাবির বিরুদ্ধে যাদের খাড়া করা যায় বা খাড়া করানোর চেষ্টা করা যায়, তাদেরই এরা স্থানীয় তকমা দিয়ে আগমার্কা করে দেন—আর অস্থানীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাদেরই যারা বাংলা ভাষা সংস্কৃতির দাবি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে। বাঙালিত্বের অনুরাগী কেউ যদি ষোড়শ শতকেও এসে থাকেন, এদের কাছে তিনি ও অস্থায়ী বলে চিহ্নিত হবেন। উপরে উল্লিখিত বিভাজন ব্যবহৃত হয় যখন শহর অর্থ দাঁড়ায় অস্থানীয় আর গ্রাম অর্থ দাঁড়ায় 'স্থানীয়'। করিমগঞ্জ জেলায় স্বাধীনতার আগে স্থানীয় অস্থানীয় বিভাজন তেমন কোনও ভূমিকা পালন করেনি, এখানে অস্থানীয় বলে এখন বিভেদকারীরা যাঁদের চিহ্নিত করেন, তাঁরা হচ্ছেন পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু।

২) দ্বিতীয় বিভাজনটা হচ্ছে কাছাড়ি ও সিলেট বিভাজন, এই বিভাজনে সাধারণভাবে বোঝানোর কথা যারা কাছাড়ের আদি বাসিন্দা এবং যারা শ্রীহট্ট থেকে পরে এসে বসবাস করছেন। কিন্তু কার্যত এই সংজ্ঞা দিয়ে কিছুই নিরুপিত হয় না। সমতল কাছাড়ে যে সামান্য সংখ্যক ডিমাসা কাছাড়ি রয়েছে তাঁরাই এসেনে ১৭৫০ সাল বা বা তার পরে। এর আগে থেকে এখানে বাঙালি যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁরা সবাই প্রায় এসেছেন শ্রীহট্ট থেকে। এক্ষেত্রেও মোটামুটিভাবে ব্রিটিশ শাসনের আগে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছাড়ি সংজ্ঞায় ধরা হয়, তার তারপর ব্রিটিশ শাসনের সূত্রে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা পরিচিত হন সিলেটি হিসাবে, যদিও আগেই বলেছি আগে পরে যখনই এসে থাকুন এই উপত্যকার বঙ্গবাসীদের শতকরা পঁচানব্বই শতাংশই শ্রীহট্টাগত, ভাষাসংস্কৃতি আচার-আচরণে কোনও পার্থক্য নেই, তাই বিভাজনটা এমনিতে নিরর্থক। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের অগ্রসর অংশকে চিহ্নিত করা হয় সিলেটি হিসাবে, মুসলমানরা যে যখনই আসুন না কেন, তাদের কাছাড়ি বলে দলে রাখার চেষ্টা করা হয়। এই বিভাজন যখন কার্যকর করার চেষ্টা হয় তখন শহর বলতে বোঝায় সিলেটি এবং গ্রাম বলতে বোঝায় 'কাছাড়ি', করিমগঞ্জ জেলা শ্রীহট্টেরই অংশ হওয়ায় এখানে ওই বিভাজন নেই।

৩) বর্ণহিন্দু এবং তথাকথিত নিম্নজাতির বিভাজন, হিন্দু সমাজের এই বিভাজনও সর্বভারতীয়, কিন্তু বরাক উকত্যকায় তার প্রয়োগ স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রেই এই বিভাজনকে ব্যবহার করা হয়, চা শ্রমিকের ক্ষেত্রে নয়। আবার এই বিভাজনকে যখন ব্যবহার করা হয় তখন স্থানীয় অস্থানীয় বিভাজনটা ভুলে যাবার চেষ্টা হয়। এই বিভাজনে বর্ণহিন্দুদের ধরা হয় শহরে, আর অন্যরা গ্রামীণ।

৪) বরাক উপত্যকার বাঙালি সমাজের সবচাইতে প্রত্যক্ষ ও কার্যকর বিভাজনটা হিন্দু-মুসলমান ভিত্তিতে ঘটে থাকে। এই বিভাজনকে যখন স্থায়ন রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়, তখন হিন্দু চিহ্নিত হয় শহরে হিসাবে এবং মুসলমান গ্রামীণ হিসাবে।

৫) বিভাজন প্রক্রিয়াটা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়, তখন শুধু মাত্র বাঙালি বর্ণহিন্দুকে রাখা হয় একদিকে, আর বাঙালি মুসলমান, তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু, চা-শ্রমিক, মিতেই মণিপুরি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, ডিমাছা, বিভিন্ন পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সবাইকে রাখা হয় তার বিপরীতে। ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে বিভাজন প্রক্রিয়াটাকে এই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। যদিও বিভেদকারীরা পুরো মাত্রায় সফল হয়নি। ওই সময়ে শহরে বলতে বোঝানো হতো শুধু বাঙালি, শুধু বাঙালি বর্ণহিন্দু, অন্য সবাই গ্রামীণ।

অসমিয়া সম্প্রসারণবাদের সবচাইতে শক্তিমান ও নিরলস প্রবক্তা অসম সাহিত্য সভা বরাক উপত্যকায় এই ধরনের বিভাজনের একাধিক প্রক্রিয়াকে সতত সক্রিয় রাখার চেষ্টা করে থাকে। উক্ত সংগঠনের শিলচর শাখার ১৯০৯ শকাব্দের (১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) স্মারকগ্রন্থ থেকে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যাতে ওই প্রয়াসের স্বরূপটা পরিষ্কার হয়। অসম সাহিত্যসভার শিলচর শাখার উক্ত স্মারক গ্রন্থে বরাক উপক্যকার বঙ্গভাষী নজরুল হক মাঝারভুঞা লিখেছেন বরাক উপত্যকার ভাষা সম্পর্কে ঃ

বরাক উপত্যকাত বসবাস করি থকা থলুয়া হিন্দুমুসলমান আরু বিভিন্ন খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহের সংমিশ্রণীতে এই উপত্যকার বর্তমান প্রচলিত ভাষার সৃষ্টি হৈছে আরু আরবী, পার্ছী ধেয়ান আরু অসমিয়া ভাষার লগত ইয়াক যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

(বঙ্গানুবাদ ঃ বরাক উপত্যকায় বসবাসকারী স্থানীয় হিন্দু মুসলমান আর বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এই উপত্যকার বর্তমান প্রচলিত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে এবং আরবী, ফার্সী, ধেয়ান ও অসমিয়া ভাষার সঙ্গে এই ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।)

লক্ষণীয় যে এখানে বরাক উপত্যকার বর্তমান প্রচলিত ভাষার কথাটি বলা হয়েছে কিন্তু সেই ভাষার কোনও নাম নেই। পরের বছর অসম সাহিত্য সভার হাইলাকান্দি অধিবেশনে, ওই অধিবেশনের মূল সংগঠনক শহিদুল আলম চৌধুরী তারই নাম দিয়েছেন 'বরাকী' ভাষা, যা বাংলা নয় বলে তাঁর ধারণা। আরও মজার ব্যাপার যে মাঝারভূঞা সাহেব বরাক উপত্যকায় প্রচলিত নামহীন এই ভাষার সঙ্গে মিল খুঁজে পান নি। আরেকটু চেষ্টা করলে মাঝারভূঞা সাহেব এই অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে গ্রিক ল্যাটিনের মিলও নিশ্চয়ই খুঁজে পেতেন, কিন্তু বাংলার সঙ্গে পাবেন না কারণ সেখানে প্রভুদের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে। কথায় বলে দেবদূতরা যেখানে প্রবেশ করতে ভয় পায় মুর্খেরা সেখানে অবলীলায় ঢুকে পড়ে। ভাষাতত্ত্ব একটি জটিল বিষয়, কিন্তু অসম সাহিত্যসভার কৃপায় বরাক উপত্যকায় যে কোনও মুর্খই ভাষাতত্ত্ব লিখে ফেলতে সাহস পায় এবং স্মারক গ্রন্থের মতো জায়গায় সেই সমস্ত ছাইভস্ম অবলীলায় ছাপাও হয়।

অসম সাহিত্য সভার যার কর্তাব্যক্তি, বরাক উপত্যকার জনবিন্যাস সম্পর্কে তাদের বিশ্লেষণ পুর্বোধৃত সূত্রকে অবলম্বন করেই রচিত, তবে যেহেতু তাঁরা খোদ রাজার জাতের প্রতিনিধিত্ব করছে, অতএব তাঁদের ভাষা আরও আক্রমণাত্মক এবং অশালীন। দৃষ্টান্ত-অসম সাহিত্য সভার ওই স্মারক গ্রন্থ থেকেই মথুরা মোহন শর্মার বক্তব্য তুলে ধরেছি -

অতীত বুরঞ্জীর পরা আমি পাও কাছাড়ের আদি তথা মূল বাসিন্দা হৈছে ডিমাসা কাছাড়ী হকল। পিছর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ত অসময় অইনঠাইর পরা বিভিন্ন ফৈদর মানুহগৈ তাত বাস করিবলৈ লগ্ন। এই আটাই বিলাক হৈছে আমার খিলিঞ্জিয়া লোক। পিছত ভারতত মুছলমান রাজত্বর কালছোত কিছুসংখ্যর মানুহও বঙ্গদেশের পরা ভাগি আহি তাত থাকিবলৈ লয়। এই মুছলমান খিনিক দ্বিতীয় পর্যায়ক খিলঞ্জিয়া বুলিব পারি।...বাঙালি হিন্দু আরো মুসলমানর বিশেষকৈ বাঙালি হিন্দুখিনির সরহ সংখ্যক ভগনীয়া হিচাবে ১৯৪৭ চনত ভারতে স্বাধীনতা পোয়ার সময়ত কাছাড়ত সোমায়। এই ভগণীয়া খিনি শিলচর করিমগঞ্জ আদি টাউন আরু ইয়ার কাষরে পাছরে থাকিবৈলে লয়। স্বাধীনতার পিছত বিশেষকৈ ১৯৭০-৭১ চনত বাংলাদেশ যুদ্ধর সময়ত কিছু বাঙালি হিন্দু আরু মুসলমান অনুপ্রবেশকারী হিচাপে কাছাড়তো সোমায়।...এই ভাষিক সংখ্যালঘু খিনি শিক্ষার ক্ষেত্রত কাছাড়র খিলঞ্জিয়া লোক খিনির তুলনাত উন্নত বা বেশি আগ্রহী আরু চতুর। সেয়ে বর্তমান বরাক উপত্যকার আরু লগতে তার খিলঞ্জিয়া মানুহ খিনির ওপরত নিজর প্রাধান্য বজায় রাখিব পারিছে।

(বঙ্গানুবাদ ঃ অতীত ইতিহাস থেকে আমরা পাই যে কাছাড়ের আদিম অধিবাসী হচ্ছেন ডিমাসা কাছাড়ীরা। পরে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আসামের অন্যান্য জায়গা থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ এসে এখানে বাস করতে শুরু করে। এরা সবাই আমাদের স্থানীয় মানুষ। পরে ভারতে মুসলমান রাজত্বের সময়ে বঙ্গদেশ থেকে কিছু মুসলমান পালিয়ে এসে এখানে বাস করতে শুরু করে। এই মুসলমানদের আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থানীয় মানুষ বলতে পারি।... বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুরা ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার সময়ে পলাতক হিসাবে কাছাড়ে এসে ঢোকে। এই পালিয়ে আসা মানুষগুলি শিলচর করিমগঞ্জ ইত্যাদি শহর ও তার আসে পাশে বাস করতে থাকে। স্বাধীনতার পরে বিশেষ করে ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে কিছু সংখ্যক বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান অনুপ্রবেশকারী হিসাবে কাছাড়ে ঢোকে।... এই ভাষিক সংখ্যালঘু মানুষগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে কাছাড়ের স্থানীয় লোকদের তুলনায় উন্নত বা বেশি আগ্রহী এবং চতুর। তাই বর্তমান বরাক উপত্যকায় আর তার বাসিন্দাদের উপর এরা নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখত পারছে।)

এই বক্তব্যের মধ্যে ইতিহাস চর্চার যে কিম্ভুত পরাকাষ্ঠা রয়েছে, সে সম্পর্কে যতই কম বলা যায়, ততই ভাল। ক্লাস সেভেন বা ক্লাস এইটের ছাত্র যতটুকু ইতিহাস জানে, সেটুকুই যদি মথুরামোহন শর্মার জানা থাকত, তবে তিনি এমন সমস্ত উদ্ভট কথাবার্তা বলতেন না। অবশ্য একটু বলা দরকার এ জাতীয় মিথ্যাচারও আজ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইতিহাসের আবরণে বাজিমাৎ করেছে, এমনকী ড. ভূপেন হাজারিক, হিতেশ ডেকা অসম সাহিত্য সভার সভাপতি হিসাবে যে সমস্ত বক্তব্য উত্থাপন করেছেন, তাতেও বরাক উপত্যকা সম্পর্কে এই ধরনের ঐতিহাসিক ছাইভস্ম বিস্তর পরিবেশিত হয়েছে। যাইহোক, মথুরা শর্মার ইতিহাসও সমাজ বিশ্লেষণটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে বরাক উপত্যকায় কী কী ধরনের বিভাজন অসম সাহিত্য সভা বা তার সহযোগী আসু-অগপ ইত্যাদি আনাতে চায় তার রূপ রেখাটা এখানে পাওয়া বিভাজনের যে বিবরণ দিয়েছি - তাতে ইন্ধন যোগানের ব্যবস্থাটা কোথা থেকে করা হচ্ছে, তার আভাস মথুরা মোহন শর্মার এই গবেষণা (?) থেকে অনায়াসে আবিষ্কারযোগ্য।

তিন

বরাক উপত্যকার বঙ্গভাষী সমাজের মধ্যে বিভাজন যে রয়েছে সে কথা মেনে নিয়েই আলোচনা শুরু করছি। সে বিভাজনটা একটি একভাষিক সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজন, সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণবাদীরা সেটাকেই একাধিক ভাষিক পরিচয়টাকে বিশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে রচিত। এই প্রকল্প অকারণে রচিত হয়নি, যাঁরা রচয়িতা তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে এই উপত্যকার বঙ্গভাষী সমাজ নিজেদের মধ্যেকার বিভাজনকে এতটা স্থায়িত্ব দান করেছেন যে বিভাজিত কোনও কোনও অংশ থেকে দলছুট এমন কিছু মানুষ বের করে নিয়ে আসা সম্ভব, যাঁরা তাঁদের প্রকল্পের শরিক, তাঁরা এ ধরনের ব্যবসায় নামতে সাহসী হতেন না, যদি সেই সামাজিক বর্গের যারা অংশ, সেখান থেকে তীব্র প্রতিরোধ মোকাবিলার ভয় তাদের থাকত। বরাক উপত্যকায় সে ধরনের প্রতিরোধ ঘটে না। তার সবচাইতে বড় কারণ আগেই উল্লেখ করেছি — সামাজিক বিভাজনের দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্ব প্রতিটি বর্গকেই এমন এক ধরনের নিমগ্নতায় আচ্ছন্ন করেছে যে সাংস্কৃতিক পরিচিতির ব্যাপারটাকে তাঁরা গৌণ বলেই ভাবেন। কেন ভাবেন, সে প্রশ্ন আপাতত উঠছে না, বরঞ্চ সামাজিক ক্ষেত্রে বর্তমান এই বিভাজনগুলির ইতিহাসগত প্রেক্ষিত নির্ণয় করাটা অধিকতর জরুরি।

শহর গ্রাম বিভাজনের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। কোনও রকম গবেষণা ব্যতিরেকেই এই সত্য সকলের কাছেই প্রতিভাত যে বরাক উপত্যকায় শহরের জন্ম হয়েছে ব্রিটিশ আগমনের পর এবং ব্রিটিশেরই প্রয়োজনে। সে প্রয়োজনের যে প্রায়োগিক দিক, তা সঙ্কুলানের মতো কুশলী জনবল বরাক উপত্যকায় ছিল না। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁদের বলেছে প্রশাসনের ছোট শরিক, অর্থাৎ ইংরেজি জানা নিম্নতর সরকারি কর্মচারী হিসাবে এলেন বাইরের লোক - বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে, মুখ্যত সিলেট থেকে, কারণ ওই সমস্ত অঞ্চলে ইংরেজি নবিশ লোক তখন তৈরি হয়ে গেছে, প্রায় সাত দশক আগে ব্রিটিশ অধিকারে যাওয়ার সুবাদে এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কাজ চালানো গোছের ইংরেজি জানতেন কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বলতে যা বোঝায় তা এরা ছিলেন না। এই নব্য ছোট আমলারা সর্বত্রই সাধারণ মানষের কাছে ভয়াবহ জীব হিসাবে পরিচিত ছিলেন - বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড়ের চরিতে তারই প্রকৃত বিবরণ লিখে গেছেন। বঙ্গের অন্যান্য জেলায় এই ধরনের ছোট আমলাদের ভ্রষ্টাচার নিয়ে অভিযোগ, ক্ষোভ সবই ছিল, কিন্তু তা কোনও আঞ্চলিক মাত্রা অর্জন করেনি। সদ্য ব্রিটিশ করতলগত কাছাড় জেলায় তা করল; কারণ সকলেই তখন আগন্তুক, এবং শিলচর শহরে সামাজিক ভিত্তিই গড়ে তোলেন এই আগন্তুকরাই। এঁদের অগ্রণী অংশ ছিলেন শ্রীহট্ট ও প্রতিবেশি জেলার শ্রীহট্ট সংলগ্ন অঞ্চল থেকে আগত এবং জাতিতে বর্ণ হিন্দু। শহর শ্রীহট্টাগত ও বর্ণহিন্দুর সমীকরণের পরবর্তী ভিতটি কাছাড়ের ইতিহাসের এই পালাবদলের পর্যায়টাতেই গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাত কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে নব্যবঙ্গ আন্দোলন ওই সময়টাতে তৈরি করেছিল প্রত্যন্তবর্তী জেলায়ই তার প্রতিফলন বিলম্বিত ও সীমায়িত ছিল। কাছাড় জেলায় তার ছিটেফোঁটা পৌঁছানো শুধু শ্রীহট্টের দৌত্য মাধ্যমেই সম্ভব ছিল, কিন্তু অপরকে প্রভাবিত করার মতো শক্তি শ্রীহট্টের অভ্যন্তরে সে আন্দোলন সঞ্চয় করতে পারে নি। ফলে শিলচর শহরকে কেন্দ্র করে যে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি কার্যত কাছাড় জেলার বাঙালি সমাজের অগ্রণী অংশ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে কোনওরূপ উদার ও সমন্বয়বাণী দৃষ্টির উন্মেষ তার মধ্যে দুর্লক্ষ্য ছিল। বরঞ্চ বিপরীতটাই ছিল সত্য। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। নরসিং মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিধুভূষণ সেন সম্পাদিত সাপ্তাহিক শিলচর'ই শিলচরে প্রাচীনতম সংবাদপত্র। বিধু পণ্ডিত নামে পরিচিত এই সাংবাদিক অসীম সাহসী ছিলেন। নিজে সরকার নির্ভর বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও স্কুল ইন্সপেক্টর বা ডি পি আই-কে আক্রমণ করে লিখতে তিনি দ্বিধা করতেন না। যাই হোক ১৯০৩ সালের (১৩১০ বঙ্গাব্দ) ২৯ জুলাই তারিখে তিনি নিবন্ধ লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও লিখতে ভুললেন না যে হেডমাষ্টার মশাই নিম্নতর জাতিভুক্ত এই পাচককে নিযুক্ত করেছেন। কারণ তিনি নিজে ব্রাহ্মণও নন, কায়স্থও নন।

ঐতিহাসিক জয়ন্তভূষণব এই ঘটনার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে বিধুভূষণ সমসাময়িক সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সাহসী ও সৎ সাংবাদিক হিসেবে তার যে প্রাপ্য মর্যাদা তা এতে ক্ষুণ্ণ হয় না, এই যুক্তি স্বীকার্য। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ক নিরিখে এই ঘটনাটি যদি আমরা বিচার করতে চাই তবে দেখতে হবে এই সংবাদ ও মন্তব্য ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বর্ণের বাইরের অন্য মানুষের মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। নিশ্চিতই তাঁরা এটাকে বর্ণহিন্দুর আত্মম্ভরিতা এবং নিম্নতর বর্ণসমূহের প্রতি ঘৃণার দ্যোতক হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। দুটো সামাজিক শ্রেণীর মধ্যেকার অসাম্যের ব্যাপারটা যখন এ ধরনের প্রকাশ্য বিতর্কে পরিণতি লাভ করে তা বেশ দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকে শেষ পর্যন্ত তা প্রতীকায়িত হয়ে যায়। সামাজিক বিভাজনের প্রয়োজনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতীক খুবই কার্যকর। সমান্তরাল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৪৪ সালে গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষ পদে প্রয়াত নিবারণচন্দ্র লস্করের দাবি অস্বীকৃত হওয়ার সে ঘটনা কাছাড়ে জাতি ভিত্তিক বঞ্চনার একটা প্রতীকে পরিণত হয়। নিবারণ বাবু পরবর্তী জীবনে স্বীয় কৃতিত্ব ও চরিত্র বলে সম্মানের শিখরে উঠেছেন, কিন্তু ওই প্রতীকের কার্যকারিতা তখনও অক্ষুন্ন রয়েছে।[১]

যাই হোক, হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নতর বর্গের মানুষের সঙ্গে বর্ণহিন্দুর সামাজিক দ্বন্দ্ব শ্রীহট্টেও ছিল। কিন্তু কাছাড় জেলায় পরিপ্রেক্ষিত ছিল কিঞ্চিৎ ভিন্ন। শ্রীহট্টে বাঙালি হিন্দু সমাজের আচরণ বিধির পেছনে প্রায় দেড় হাজার বছরের ধারাবাহিকতা ছিল, ফলে বর্ণভেদ সেখানে এক ধরনের ঐতিহ্যগত বৈধতা পেয়েছিল। তদুপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেখানে সামন্তবাদী আনুগত্যকে আরও প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণের দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারকে বিধিলিপি হিসাবে মেনে নেওয়ার আবহ শ্রীহট্টে বর্তমান ছিল। তৎকালীন কাছাড়ে বিস্তৃত জনবসতির কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। লোকনাথের জয়তুঙ্গবর্ষ, ভুবন পাহাড়ের স্থাপত্যকীর্তির সাক্ষ্য, হাইলাকান্দির প্রত্ন সাক্ষ্য, কোচ রাজাদের রাজ্য সংস্থাপন, ডিমাছা কাছাড়ীদের খাসপুর আগমন ইত্যাদি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে জনবসতি সীমাবদ্ধ ছিল বিচ্ছিন্ন কিছু পকেটে। বর্ণাশ্রম ভিত্তিক পরিপূর্ণ হিন্দু সমাজ ধারাবাহিকতা নিয়ে সেখানে গড়ে ওঠেনি। ডিমাছা রাজারা উর্বর কাছাড়ে উদার যে জমিবন্টন নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার সুযোগ নিয়ে গ্রামাঞ্চলের নিম্নতর বর্ণের যে সমস্ত মানুষ নিজস্ব চাষবাসে ক্ষেত্র উন্মোচিত করেছিলেন, তারা স্বস্ব অঞ্চলে নিজস্ব সামাজিক আবহ গড়ে তুলেছিলেন এবং তার সঙ্গে শ্রীহট্টের কট্টর হিন্দু সামাজিক মূল্যবোধের পর্যাপ্ত পার্থক্য ছিল। ব্রিটিশ আগমনের দেড়শ দু'শ বছরে যে গ্রাম কাছাড় গড়ে উঠেছিল, জাতপাত ও সামাজিক আচার আচরণের ব্যাপারে সেখানে তুলনামূলক বিচারে অনেক বেশি মুক্ত ও উদার পরিবেশ বিরাজমান ছিল। ফলে সদ্য আগত শ্রীহট্টীয় বা অন্য জেলাবাসী শহরবাসী নাগরিকরা গ্রাম কাছাড়ের মানুষের মর্যাদাবোধের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাঁধতো। এমনকী গ্রাম কাছাড়ের বর্ণহিন্দু যাঁরা ডিমাছা বা তৎপূর্ববর্তী আমল থেকে গ্রাম কাছাড়ে বসবাস করে আসছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও শহরে বর্ণহিন্দুদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ অনেকটাই ঘটে গিয়েছিল। বড়খলার জমিদার বিপিনচন্দ্র দেব লস্কর বা উদারবন্দের কাছাড় কেশরী সনৎ কুমার দাসের সঙ্গে পরবর্তীকালে শহরবাসী রাজনীতিবিদদের যে মতপার্থক্য ঘটত - তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনেকটাই কার্যকর ছিল।

কাছাড় জেলার প্রাক-ব্রিটিশ মুসলিম বাসিন্দাদের সম্পর্কেও এই একই ধরনের বিশ্লেষণ প্রযোজ্য। ডিমাছা রাজাদের সময়ে এঁরা কাছাড়ে আসেন মূলত সিলেট থেকে এবং পতিত জমি আবাদ করার ক্ষেত্রে এদের যে কুশলতা ছিল, তারই দৌলতে তারা অনেক সমৃদ্ধ কৃষকে পরিণত হয়েছিলেন। ডিমাছা

রাজ দরবার থেকে অর্থের বিনিময়ে উপাধি বেচা হত এবং সমৃদ্ধ অনেক মুসলমান কৃষক পরিবারই ওই ধরনের উপাধি অর্জন করেছিলেন। ডিমাছা আমলে ওই ধরনের সমৃদ্ধ মুসলমানরা মর্যাদাবান শ্রেণি হিসাবে গণ্য হতেন। ডিমাছা রাজদরবারের সম্মানিত সভাসদ গুলু মিয়ার জীবনদানের বিনিময়ে আত্মমর্যাদা রক্ষার ঘটনার মধ্যে আমরা এই মর্যাদাবোধের প্রমাণ পাই। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগের সোনামিয়া চৌধুরীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের যে বিবরণ ঐতিহাসিক দেবব্রত দত্ত সংকলিত করেছেন Cachar District Records গ্রন্থে, তাতে বোঝা যায় সোনামিয়া চৌধুরীও মর্যাদার লড়াই লড়েছিলেন। ওই সোনামিয়া চৌধুরীর সামাজিক প্রতিপত্তির পরিমাপ ও আমরা করতে পারি যখন দেখি দু'টি আখড়ার সেবায়েত বৈরাগীদের তাড়িয়ে দিয়ে তিনি নিজের পছন্দমত বহিরাগত দুজন বৈরাগীকে ওই আখড়াগুলিতে বসাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা কোনও প্রশংসনীয় বা অনুকরণযোগ্য আচরণ নয়, কিন্তু এমনটি তিনি করতে পারতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর সামাজিক নেতৃত্বের অমোঘ প্রভাব তো প্রশ্নাতীত। ক্ষমতাবান এই সমস্ত গ্রামীণ সম্পদবানরা নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর নীচু তলার কর্মীদের সংশ্রবে যখনই যেতেন, বৈষয়িক কারণে যেতেই হত, তখন অধিকাংশ সময়েই তিক্ত স্মৃতি নিয়ে ফিরতেন, এদের মর্যাদা বোধের সঙ্গে শহুরে মানুষের একধরনের বৈপরীত্য সেই কারণেই তৈরি হয়েছিল।

প্রথম অবস্থায় এই দ্বন্দ্বে কোনও উত্তাপ সঞ্চারিত হয় নি, কিন্তু গ্রাম কাছাড়ের হিন্দু মুসলমান শ্রেণী ইংরেজি শিক্ষায় প্রথম অবস্থায় আগ্রহ দেখান নি। শিলচর সরকারি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির হার পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে বর্ণহিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৫১, মুসলমান ১১, অন্যান্যরা ২ - তফশিলি ও জনজাতি একজনও নয়। বর্ণহিন্দুর বড় অংশটা নিশ্চয়ই ছিল শহরবাসী; কিন্তু দুই দশক পর দেখি সে হারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, তখন বর্ণহিন্দু ২৭৩, মুসলমান ১২৮, তফশিলি ২৮, অন্য নিম্নতর শ্রেণি ৩২, জনজাতীয় ২৪. বোঝা যাচ্ছে গ্রামীণ মানুষ ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে অগ্রসর হচ্ছেন। বলাবাহুল্য এতে চাকুরির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হল, এর ফলে গ্রাম শহর দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ উত্তাপেরও সঞ্চার ঘটল।

অতএব, এই শতকের গোড়ার দিকেই কাছাড় জেলায় বঙ্গভাষী জনগোষ্ঠী শহর, গ্রাম, বর্ণহিন্দু নিম্নতর শ্রেণি, মুসলমান ইত্যাদি বর্গে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপে বিভাজিত ছিল। এই বিভাজিত গোষ্ঠী সংহত একটি সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হতে পারে দুভাবে এক, অর্থনীতিতে যদি তখন গতিবেগ থাকে, যা সফল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাধ্যতামূলক লেনদেনে প্ররোচিত করতে সক্ষম। দুই, চিন্তার ক্ষেত্রে এমন অভিঘাত এবং তৎভিত্তিক আন্দোলনের সৃষ্টি যাতে যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত ও পাকাপোক্ত করার কাজটাকে সকলবর্গের স্বার্থেই অনিবার্য বলে বিবেচিত হয়।

কাছাড় জেলার কৃষিভিত্তি অর্থনৈতিক গতিবেগের পূর্বশর্ত পূরণে আদৌ সক্ষম ছিল না। চা-শিল্পে স্থানীয় শ্রমজীবীরা মুখ্য ভূমিকা থাকলে সে শর্ত আংশিক পূরণ হত, কিন্তু সেখান বিনিয়োগ ছিল বিদেশি এবং শ্রমিকরাও বাইরের। স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বিতীয় পূর্বশর্ত পূরণের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু কাছাড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের সেই তীব্রতা সৃষ্টি হয় নি কোনও পর্যায়েই। ১৯০৫ সালে নাগরিক নেতৃত্ব নিজেরাই প্রথম পর্যায়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন, পরে কামিনী চন্দের নেতৃত্ব সে আন্দোলনে সামিল হলেন বটে, কিন্তু গ্রামীণ মানুষকে টানা যায় নি। ১৯০৬ সালে সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলনে যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছিল তাতে শিলচরের প্রতিনিধি যে ২৮ জন ছিলেন, তাঁরা সবাই শিলচর শহরের মানুষ। হাইলাকান্দির তিন জনও শহরবাসী। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গ্রামীণ হিন্দু অগ্রণী শ্রেণি ততটা অগ্রসর না হলেও আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ ছিল। অরুণকুমার চন্দ গ্রামীণ বর্গগুলির সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং শহর গ্রাম সমন্বয়ের সঠিক কর্মসূচিও প্রণয়ন করেছিলেন। কারাবরণ, অসুস্থতা ও অকালমৃত্যু তার প্রয়াসকে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছতে দেয় নি। এখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন শ্রমজীবী সমাজের মধ্যে যে সমস্ত কাযকর্ম করেছিল, তাতে গ্রামাঞ্চলে তাদের প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ এবং বাঙালি জাতিসত্তার সংহতিকরণ বোধগম্য কারণেই তাদের কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত ছিল না। এই পর্যায়ে তরুণ মুসলমান যে শিক্ষিত শ্রেণি হয়ে উঠে আসেন, তাঁরা শহর গ্রাম বিভাজন অনেকটাই প্রশমিত করতে পারতেন, কিন্তু আলিগড়ীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তাঁরা বিপরীত কর্মসূচিই হাতে নিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচণে কাছাড় জেলায় ৬টি আসনের মধ্যে একটিতে কংগ্রেস জিতেছিল, সেটা লক্ষণীয়। এটাও লক্ষণীয় যে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত হাইলাকান্দি কংগ্রেসের কোনও মহকুমা পর্যায়ের সংগঠনও ছিল না।

আগেই বলেছি যে করিমগঞ্জে জেলার সামাজিক সংগঠন কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ছিল। শ্রীহট্টের অংশ হিসাবে তার সামাজিক কাঠামো প্রাচীন ইতিহাসকে বহন করছিল। হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতি বৈষম্য পুরোই ছিল, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যের ফলে তা ছিল অন্তর্লীন। করিমগঞ্জ শহরের অধিবাসীদের একটা বড় অংশ ছিলেন মুসলমান এবং আরেকটা বড় অংশ ছিলেন গ্রামীণ সমাজের সমৃদ্ধ অংশ, যার ফলে গ্রাম-শহরের বিভাজন করিমগঞ্জে ছিল না। ত্রিশের দশক থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সম্প্রসারন হিন্দু-মুসলমান বিভাজনকে অবশ্য ক্রমেই সুস্পষ্ট করছিল। চল্লিশের দশকের প্রথম অংশে কমিউনিস্ট আন্দোলন সে বিভাজনকে কোনো কোনো অঞ্চলে প্রশমিত করেছিল। ১৯৪৬-এর প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক আলোড়ন সে প্রবণতাকে বিনষ্ট করে।

দেশভাগ করিমগঞ্জের সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন কিছু মাত্রা যোগ করে, শহর থেকে মুসলমান নাগরিকরা প্রায় সকলে চলে যান, ফলে শহরে হয়ে পড়ে পুরোটাই হিন্দু। গ্রামাঞ্চলে বিপুল উদ্বাস্তু আগমন প্রাচীন জীবনযাত্রায় চাপ সৃষ্টি করে, তাতে একধরনের উদ্বাস্তুবিরূপতা গ্রামের হিন্দু-মুসলিম উভয় অংশকেই কিয়ৎ পরিমাণ প্রভাবিত করে। গ্রাম ও শহরের স্থানীয় ও অস্থানীয় - এ জাতীয় ধারণা তখন ওখানেও চালু হয়। ইতিমধ্যে উদ্বাস্তু আগমন কাছাড় জেলায় আগেকার বর্গ চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। এবং এরই মধ্যে যখন পূর্বাঞ্চলের দাবি উঠল, তখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কংগ্রেস নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকার কাছাড়-করিমগঞ্জে নতুন পুরাতন বিভাজন প্রক্রিয়া ও সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রসাদ বিতরণ শুরু করেন। ফলে কাছাড়ে প্রচলিত বর্গগুলির অনেকগুলিই করিমগঞ্জেও একধরনের ব্যবহার যোগ্যতা অর্জন করে। এবং কাছাড় করিমগঞ্জ তার ঐতিহাসিক ভিন্নতা সত্ত্বেও বর্গচেতনার ব্যাপারে একটি সাজুয্যে এসে পৌঁছে গেল। নিশ্চিতেই বরাক উপত্যকার এই দুই অংশের সামাজিক বিভাজন - চিত্রে মাত্রার তারতাম্য রয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র শক্তির বিভেদ প্রবণতাকে চাঙ্গা রাখার পক্ষে ওই সাজুয্যই যথেষ্ট।

চার

তাই স্বাধীনতার উষালগ্নে আমরা পাচ্ছি একটা বর্গবিভাজিত বরাক উপত্যকা, যে বর্গগুলির অবয়বকে পুরো একটি শতাব্দির মধ্যেও তেমনভাবে পাল্টানো যায় নি, করিমগঞ্জে বরঞ্চ একটি পশ্চাদগামী প্রবণতাই গড়ে উঠল। এই বর্গগুলি মোটামুটি একে অপর থেকে বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্নতাকে বজায় রাখাকেই এরা সামাজিক আচরণবিধির প্রাথমিক শর্ত বলে বিবেচনা করে। অনিবার্যভাবে এই চেতনার মান এদের নতুন যুগের মূল্যবোধ নিয়ে ভাবিত নয়। কোনও সংকট এলে বর্গগুলি এক বা একাধিক নিজেদের মধ্যে আঁতাত করে, আবার সংকট উত্তীর্ণ হলে যে যার খোলসে ফিরে যায়। ট্রাইবেল সমাজের মতো বর্গের

সভ্যদের প্রাথমিক আনুগত্য স্ব স্ব গোষ্ঠীর প্রতি কতকগুলি প্রাচীন মূল্যবোধ সে আনুগত্যের ভিত্তি। বঙ্গভাষী মুসলমানের সামাজিক বিভাজন কম, ফলে বৃহত্তর বর্গহিসাবে তাদের আত্মপ্রকাশ অনেক সময়ই সম্ভব হয়। বাঙালি হিন্দু জাতিবর্ণ ভিত্তিতে বিভাজিত, ফলে বর্গ হিসেবে তার তেমন কোনও কার্যকারিতা বহুদিন যাবৎ গড়ে ওঠেনি, বরঞ্চ তার অভ্যন্তরীণ বিভাজন অনেক সময়েই তার কোনও কোনও বর্গকে ধর্মবহির্ভুর্ত আঁতাতেও প্ররোচিত করে। এর ফলে যে আতঙ্ক ও আশঙ্কার সৃষ্টি, তাতে বর্ণহিন্দুরা অনেকখানি ছেড়ে দিতেও রাজি এবং তার বিনিময়ে সামাজিক আঁতাত সৃষ্টি হয়েছে। বরাক উপত্যকার অধুনাতম সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তারই পরিণতি। কিন্তু এটাও আঁতাত ভিত্তিক, সমন্বয় ভিত্তিক নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পরিপ্রেক্ষিতের পর্যাপ্ত পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও বরাক উপত্যকার এই বর্গবিভাজন শতাব্দির উত্তরাধিকার নিয়ে বজায় রইল কেন? আগেই উল্লেখ করেছি যে ব্রিটিশ আমলের বরাক উপত্যকায় কোনও অর্থনৈতিক গতিবেগ সৃষ্টি হয় নি। স্বাধীন হওয়ার পর যেটুকু অর্থনৈতিক গতিবেগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয় তার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বরাক উপত্যকার স্থানীয় পুঁজি ও তৎভিত্তিক সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি তার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে চা-শিলেপ ও বৃহৎ ব্যবসায়ে যে পুঁজিখাটে, তা এখনও বাইরের পুঁজি, তার কোনও স্থানীয় ভিত্তি নেই। অর্থের দ্বিতীয় যোগানটা আসে সরকারি অর্থভাণ্ডার থেকে, সে অর্থভাণ্ডারের উপরেও বরাক উপত্যকার মানুষের কোনও রকম নিয়ন্ত্রণ নেই। বাণীপ্রসন্ন মিশ্র[২] বলেছেন যে বরাক উপত্যকায় শ্রেণি বিভাজন ও শ্রেণি চেতনা গড়ে ওঠে নি। কথাটা তিনি সম্প্রসারণ করেন নি। তবে আমাদের সংকটের একটা ইঙ্গিত তাঁর এই মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়।

শ্রেণি বিভাজন অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে গড়ে ওঠে। প্রতিটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠীই নিজ শ্রেণি স্বার্থের প্রয়োজনে নিজস্ব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব রাজনীতি গড়ে তোলে। এখানকার অর্থনীতি যেহেতু সর্বার্থেই পরনির্ভর অতএব স্থানীয় শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে — এমন কোনও অর্থনীতির সংরক্ষণের জন্য এখানে স্থানীয় কোনও গোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি। যাদের আমরা সুবিধাভোগী শ্রেণি বলি, যারা শাসক শ্রেণি গড়ে তোলে তারা তাদের নিজস্ব আধিপত্য বজায় রাখার জন্য নিজস্ব দর্শন ও সেই দর্শনের প্রভাবের উপযোগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে গড়ে তোলে। বরাক উপত্যকার ওই সুবিধাভোগী শ্রেণি কোনও সময়েই আংশিকভাবেও স্বনির্ভর নয়, অতএব নিজস্ব শ্রেণি চেতনাদ্বারা তাঁরাও পরিচালিত নন। পরগাছা অর্থনীতির যাঁরা স্থানীয় এজেন্ট, তাঁদের ধ্যান - ধারণা রূপায়িত করাটাকেও এখন পর্যন্ত বরাক উপত্যকায় একটি প্রগতিশীল দায়িত্ব হিসবে বিবেচনা করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিচারে স্থানীয় বুর্জোয়া এখানে নেই এবং তার যে দায়িত্ব পালন সামাজিক বির্বতনের ক্ষেত্রে পালিত হওয়ার কথা ছিল, সে দায়িত্ব সে পালন করছে না। ফলে প্রাক বুর্জোয়া সমাজের বর্গগুলি এখানে বহাল তবিয়তে বজায় রয়েছে। যে ধরনের সামাজিক শক্তির উদ্ভব সে সমস্ত প্রাচীর ভেঙ্গে বাঙালিত্বের উন্মেষকে সুনিশ্চিত করতে পারত, তার উদ্ভব এ উপত্যকায় হয়নি।

এর ফলে লেজুড়বৃত্তি এ উপত্যকার বিধিলিপিতে দাঁড়িয়ে গেছে। আন্তেনিয় গ্রামশ্চি ইতালির উন্নত উত্তরাংশ ও অবনত দক্ষিণাংশের সম্পর্ক নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রাক্-ফ্যসিস্ত বিশ্লেষণে যা বলেছিলেন, তা এখানে প্রণিধানযোগ্য ঃ

The South was reduced to the states of a semi colonial marker, a source of savings and taxes, and was kept disciplined by measures of two kinds. First police measures pitiless repression of every mass movement, with periodical measures. Second, political personal favours to the intellectual stratum in the form of jobs in the public administration, of licence to piliage the local administration with impunity, i.e. incorporation of the most active southern elements individually into the leading personal of the state, with particular judicial and bureaucratic privileges. Thus the social stratum which could have organised endemic southern discontents, instead became an instrument of Northerm policy, a kind of auxiliary private police. Southern discontent, for lack of leadership, did not succeed in assuming a normal political form

এই পরগাছা বৃত্তিরই চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে নির্বাচনী রাজনীতি ও ফলাফলে, যখন দেখা যায় যে বরাক উপত্যকার অঞ্চলভিত্তিক কোনও ইস্যু এখানকার নির্বাচনী ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করে না, উত্তর ভারত বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতালাভে সক্ষম দলের প্রভাব উপত্যকা নিরপেক্ষভাবেই এখানে কার্যকর ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই যে পরিস্থিতি তা থেকে উত্তরণের উপায় কী? বলাবাহুল্য, যে ধরনের স্বনির্ভর অর্থনীতির জন্ম পরিস্থিতিকে পাল্টে দিতে পারত, ঐতিহাসিক বিচারেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অর্থনীতির অংশ বরাক উপত্যকায় তার স্বাধীন উদ্ভব সম্ভব নয়। সমাধানের জন্যও আবার আমরা গ্রামশ্চিরই স্মরণাপন্ন হচ্ছি ঃ

When the impetus of progress is not tightly linked to a vast local economic development which is artificially limited and repressed but is instead the reflection of international developments which transmit their ideological currents to the periphery - currents born on the basis of the productive development of the more advanced countries - then group which in the bearer of the new ideas in not the economic group but the intellectual stratum.

অর্থাৎ কোনও অঞ্চলের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিকাশের পথ যখন কৃত্রিম উপায়ে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তখন যদি দেখা যায় দুনিয়া জোড়া যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড চলছে তার বিচ্ছুরণ হিসাবে নতুন আদর্শ ওই অনুন্নত অঞ্চলকেও স্পর্শ করেছে, তখন অর্থনৈতিক কোনও গোষ্ঠী সেই নতুন চেতনার বাণীবাহক হয় না, তখন বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকেই সেই নতুন চিন্তার যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করার দায়িত্ব নিতে হয়।

আমি কোনও স্বতন্ত্র কর্মসূচি প্রস্তাব হিসাবে উথাপন করছি না। বরাক উপত্যকায় যথার্থ বাঙালি সমাজ গড়ে ওঠার পথে দুটো অন্তরায়ই শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। তার একটা গ্রাম ও শহরের বিভাজন, দ্বিতীয়, হিন্দু-মুসলিম বিভাজন। তার সঙ্গে আরও কিছু আঞ্চলিক প্রেক্ষিতের প্রশ্নও রয়েছে। বরাক উপত্যকায় অন্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহ রয়েছেন, তাদের স্বাধিকার ও সকল ধরনের বিকাশ-প্রক্রিয়াকে অক্ষুণ্ণ ও অবারিত রেখে বরাক উপত্যকার বাঙালি সমাজের যথার্থ বিকাশ বরাক উপত্যকার জনগণের যৌথ সমাজ গড়ে তোলারও পূর্বশর্ত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতেও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য, কারণ আজকে বরাক উপত্যকার মতো একটি প্রান্তিক অঞ্চলও সে ধরনের প্রেক্ষিতের অনুকূল ও প্রতিকূল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অংশীদার। সমাজগঠনের

প্রক্রিয়া বহুমাত্রিক, জটিল ও প্রবহমান। তার জন্য কর্তব্যসূচি নিরূপণ আমার সাধ্যাতীত। আমার এই আলোচনায় কিছু বিশ্লেষণ রয়েছে, তা সত্য মিথ্যা বা অতিসরলীকৃত হতে পারে, আংশিক বা অপূর্ণ তো বটেই - বরাক উপত্যকার ভবিষ্যৎ নিয়ে শহর ও গ্রামে যারা ভাবিত, তাঁরা সচেতন প্রজ্ঞায় ও অকুণ্ঠ পরিশ্রমে ও সম্পর্কে পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটন করুন এবং সেই উদ্‌ঘাটনের ভিত্তিতে জনগণের চলার পথের দিশারী হোন, এই আহ্বানই শুধু এই মুহূর্তে জানানো যেতে পারে।

*** এই প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে লেখকের 'বরাক উপত্যকার সমাজ ও রাজনীতি' গ্রন্থ থেকে।**

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. ১৯৬১-র ১৯ মে শিলচরে এগারো জন, ১৯৭২-এর ১৭ আগষ্ট করিমগঞ্জে একজন এবং ১৯৮৬-র ২১ জুলাই করিমগঞ্জে দু'জন ভাষা সংগ্রামী শহিদ হন।

২. ডঃ বানীপ্রসন্ন মিশ্র সেন্টার ফর হিমালয়ান স্টাডিজের সঞ্চালক ছিলেন।